অধ্যায় ৪ ঃ উপন্যাস - *কপালকুণ্ডলা* — ২

অধ্যায়-বিন্যাস

৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৪.২ পরিচিতি
৪.৩ চরিত্র-বিচার
৪.৩.১ নবকুমার
৪.৩.২ কপালকুণ্ডলা
৪.৩.৩ মতিবিবি বা লুৎফউন্নিসা
৪.৩.৪ কাপালিক
৪.৪ অলৌকিকতা
৪.৫ অধ্যায়-সংক্ষেপ
৪.৬ অতিরিক্ত পঠন
৪.৭ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর
৪.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি জানতে বা বুঝতে পারবেন—

- নায়িকা কপালকুণ্ডলা ও নায়ক নবকুমারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
- কাপালিক চরিত্রের ভয়ঙ্কর দিক; তার প্রতিশোধস্পৃহা
- মতিবিবি ওরফে পদ্মাবতীর প্রেম, প্রবৃত্তি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা
- আরণ্য জীবনের সংস্কার ও সামাজিক জীবনের জটিলতা এই উপন্যাসে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে, তার তাৎপর্য।

৪.২ পরিচিতি

এর আগের অধ্যায়টিতে আপনারা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী, তাঁর সাহিত্য-জীবন এবং তাঁর উপন্যাসের ধারাবাহিক পরিচয় সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়েছেন। তার সঙ্গে আলোচ্য *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত কাহিনি, বিষয়-বৈচিত্র্য প্রসঙ্গও জেনেছেন। উপন্যাসটিতে ইতিহাসের উপাদান কীভাবে যুক্ত হয়ে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে — তাও আলোচিত হয়েছে। তা ছাড় বনচর জীবন ও সামাজিক-পারিবারিক জীবনের সংঘাতের বিষয়েও আপনারা অবহিত হয়েছেন।

এই অধ্যায়ে আপনারা *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসের মূল চারটি চরিত্র সম্পর্কে জানতে পারবেন। পাশাপাশি উপন্যাসটিতে অলৌকিকতার প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে — তাও আলোচিত হবে।

৪.৩ চরিত্র-বিচার

আসুন, এবার আমরা *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসের কয়েকটি প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র নিয়ে আলোচনা করি। এই উপন্যাসে যেসব চরিত্র মুখ্য, তারা হল— নবকুমার, কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি এবং কাপালিক। তা ছাড়া কয়েকটি গৌণ চরিত্র রয়েছে, যেমন— অধিকারী, শ্যামাসুন্দরী, পেষমন, সেলিম ইত্যাদি। প্রথমেই মুখ্য চরিত্রের বিষয়ে সম্যক আলোচনা করছি আমরা।

৪.৩.১ নবকুমার

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের নায়ক নবকুমার, এ নিয়ে কোনো আপত্তি বা বিচার বিশ্লেষণ থাকতে পারে না। উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রও তিনিই। তাঁরই জীবনের ভাগ্য-বিড়ম্বিত ইতিহাস এই উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে শুরু থেকে। এবং এই ঘটনার সঙ্গে কপালকুণ্ডলা নামক বনচর এক যুবতীর সংযোগ ঘটেছে। আর শেষমেশ সেই বনচর যুবতীর কথাই সমধিক প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নবকুমার উপন্যাসে এক অনিবার্য বিন্দু রূপে প্রতিভাত। তাঁর ও কপালকুণ্ডলার শোচনীয় পরিণতির মধ্য দিয়েই উপন্যাসের সমাপ্তি। প্রধান পুরুষ চরিত্র হিসাবে এই উপন্যাসের নায়কও তিনিই।

নবকুমারের ব্যক্তি পরিচয় সেকালে সামাজিক অবস্থান থেকে বিচার্য। তিনি ব্রাহ্মণ তনয়। নিবাস সপ্তগ্রাম। উপন্যাসের মধ্যবর্তী অংশ থেকে জানা যায়— একদা তাঁর বিয়েও হয়েছিল। প্রথমা স্ত্রী তাঁকে ত্যাগ করেছিল। আমাদের মনে হয় এইসব কারণে নবকুমার অনেকাংশে উদাসীন, আবেগতাড়িত ও সংসারের প্রতি খানিকটা বিমুখ। সহজভাবে তিনি গৃহস্থ। বাড়িতে মা এবং বোন শ্যামাসুন্দরী। 'ইষ্টকনির্মিত' গৃহ তাঁর। মোটামুটি সচ্ছলই। কিন্তু কোথাও যেন তিনি অতৃপ্ত। তাই পুণ্য-অর্জন উপলক্ষে ও দেশভ্রমণের জন্য তিনি গঙ্গাসাগর পাড়ি দিয়েছিলেন গ্রামের আর দশজনের সঙ্গে। তবে তাঁর এই যাত্রার মূলে আরেকটি কারণ হল— সমুদ্র দর্শন। অর্থাৎ নবকুমার সৌন্দর্য-বিলাসী বা সৌন্দর্য-পিয়াসী। পুণ্যঅর্জন বাহ্যত বটে, কিন্তু তা উপলক্ষ মাত্র। সমুদ্র দেখার উচ্ছ্বাসে তিনি সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করেন। এতে তাঁর মধ্যে এক রোমান্টিক মেজাজের মানুষ দেখা যায়। এই রোমান্টিকতার মধ্যে আবেগের প্রাধান্য থাকায় তাঁর চরিত্রে বাস্তববুদ্ধির অভাবও দেখা গেছে।

উপন্যাসের শুরুতে নবকুমারকে কিছুটা সক্রিয় দেখা গেলেও পরে তাঁকে অনেকাংশে নিষ্ক্রিয় দেখা যায়। উপন্যাসের প্রথম দৃশ্যেই তাঁকে উদার, পরোপকারী ও

নির্ভীক যুবক রূপে দেখতে পাই। বিপদে সকলকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষার করার আশ্বাসবাণীও শোনা যায় তাঁরই মুখে। গঙ্গাসাগরে যখন তীর্থ যাত্রীরা অকূল জলরাশির মধ্যে আতঙ্কিত— তখন তিনিই একমাত্র অবিচল। বরং মাঝিদের নৌকা চালনা বন্ধ করার নির্দেশ তিনিই দেন, বলেন— প্রভাত হচ্ছে, কয়েক দণ্ডের মধ্যেই সূর্য উঠবে এবং গন্তব্য স্থির করা যাবে। এই ধীর ও স্থির আচরণ প্রথম থেকেই নবকুমারের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নৌকা তীরে পৌঁছুলে ক্ষুধার্ত যাত্রীদের রান্নার জন্য কাঠ আনার কেউ নেই। সেইখানেও এই নবকুমার। অকুতোভয়। নদীতীরে বনমধ্যে কাঠ সংগ্রহ করতে বিলম্ব হল। কাঠের বোজাও কম নয়। নৌকা থেকে দূরত্বও অনেকখানি। ইতিমধ্যে জোয়ার এল। স্বার্থপর সহযাত্রীরা নবকুমারকে বিজন সৈকতে একাকী ফেলে নৌকা নিয়ে চলে গেল। এবং পরিত্যক্ত নবকুমারের ভাগ্য বিড়ম্বনাও তখন থেকেই শুরু। মানুষের উপকার করা ও সহৃদয়তাই তাঁর কাল হল। বস্তুত, নবকুমার সরল, কিন্তু বিচক্ষণ নন। নইলে একা বাঘ ও কুমিরে ভরা নদীসৈকতে কাঠ সংগ্রহ করার ঝুঁকি নিতেন না। সহযাত্রীরা তাঁকে ফেলে যাবে— এ-কথা তিনি যেন বিশ্বাসই করতে পারেননি। সারল্যই তাঁর সম্পদ, আবার সারল্যই তাঁর বিপদ।

যা হোক, বনমধ্যে, জনমানবশূন্য সমুদ্রতীরে ঘন জঙ্গলে প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নিয়ে তিনি খানিকটা মেনেই নিয়েছেন প্রতিকূলতাকে। তাঁর সরল অন্তঃকরণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেও পরিস্থিতিকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো কথা ভাবতে পারেনি। তাঁর সরল হৃদয় কাপালিককেও বিশ্বাস করেছে। বিশ্বাস করেছে কপালকুণ্ডলাকেও। ওই সারল্যই তাঁকে নরঘাতক কাপালিকের আশ্রয়ে এনে ফেলেছে। একবারের জন্য মনে কোনো শঙ্কা জাগেনি। বরং সমুদ্রের অসীম নীল শোভা তাঁকে গভীর আনন্দ ও প্রশান্তি এনে দিয়েছে। সমুদ্রের অফুরন্ত অনির্বচনীয় রূপের মধ্যে রোমান্টিক নবকুমার আত্মহারা হয়েছেন। সচরাচর ক্ষেত্রে এরকম বিপদের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ জাগার কথা নয়। কিন্তু নবকুমার ব্যতিক্রম। তাঁর এই ভাবুক দৃষ্টির সামনে তাই অকস্মাৎ এক অদ্ভুত অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছে। সেটি বঙ্কিমের ভাষায়—

> গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন, অপূর্ব মূর্তি ! সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণী মূর্তি ! কেশভার— অবেণীসংবন্ধ, সংসর্পিত, রাশিকৃত, আগুল্‌ফ-লম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন, যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে।

এই যে ঘটনা, সেটি যেন কবির ভাষায়— 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত'। সেই আলোর ঝলকানি নবকুমারের জীবনে কপালকুণ্ডলা। কপালকুণ্ডলা সুমিষ্ট বাক্য 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' সারা উপন্যাসেই যেন ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। বস্তুত, নবকুমার এক পথহারা নায়ক রূপে গণ্য। সৌন্দর্যপিয়াসী তাঁর মন

তখন কেবল ভেবেছে—'সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী; রমণী সুন্দরী; ধ্বনিও সুন্দর; হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্যের লয় মিশিতে লাগিল।' তাঁর মনে হয়েছে— এ দেবী, না মানবী, না কাপালিকের মায়া মাত্র !

এর পরের ঘটনা *কপালকুণ্ডলা*র পাঠক মাত্রই জানা। কপালকুণ্ডলার রূপে মোহিত বিভোর নবকুমার বাস্তবকে আবারও ভুলে গেছেন। তাঁর এই বিস্মৃতি তাঁকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। 'নরমাংস না-হলে কাপালিকের পূজা হয় না' — এই বহু প্রচলিত কথাটিও কপালকুণ্ডলা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এসব কথা তাঁর মনেই আসেনি। চরম বিপদেও তিনি নির্বিকারই ছিলেন প্রথমে। সমুদ্র ও নারীর রূপ এরকম প্রতিকূল পরিবেশেও তাঁকে বশ করেছে।

যা হোক, কাপালিকের হাত থেকে কপালকুণ্ডলার সহযোগে তিনি রক্ষা পেয়ে সেই রাত্রিতেই অধিকারী মশাইর অনুরোধে কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করেন। এটুকু পর্যন্ত নবকুমার চরিত্রের প্রথম পর্যায়। কপালকুণ্ডলার জীবনই উপন্যাসের মুখ্য উপজীব্য ধরলে— কপালকুণ্ডলার জীবনের প্রথমাংশকে অধিকতর গুরুত্ব দিতে নবকুমারের আগমন ঘটিয়েছেন বঙ্কিম। এর পরের পর্বে নবকুমার নিষ্ক্রিয় ও নিষ্প্রভ। কেননা সেখানে কপালকুণ্ডলাই মুখ্য।

এবারে প্রত্যাবর্তন। নববধূকে নিয়ে দেশে ফেরা। নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী থেকেও যখন নেই— তখন গভীর শূন্যতা নিয়ে তাঁর দিন কেটেছে। ভাবালু চরিত্র দেখে সেটা অনুমান করা যায়। কিন্তু অকস্মাৎ কপালকুণ্ডলার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তাকে বিয়ে করা— এই ঘটনা নবকুমারের জীবনে নতুন তরঙ্গাভিঘাত তুলেছে। প্রাণরক্ষাকারিণীকে বিয়ে করার জন্য সব ত্যাগই করার সংকল্প মনে এসেছে। পথে কপালকুণ্ডলার জন্য অর্থব্যয় করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি।

কিন্তু বিধি ! সেই বিধি তাঁকে তাঁর পূর্ব স্ত্রী পদ্মাবতীর সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ করিয়েছে। দীর্ঘদিন পর কন্দর্পকান্তি স্বামীকে পেয়ে পদ্মাবতী ওরফে মতিবিবির প্রবৃত্তি জেগেছে দুরকমে। প্রথমত, ভোগ-বিলাস ঐশ্বর্যে সে তৃপ্ত নয় এবং নারীর ঘর-বাঁধার স্বপ্নটি তাকে এখনও আলোড়িত করছে। এবং দুই, নববিবাহিতা স্ত্রী সহ তাঁরই পূর্ব স্বামীর সম্ভাব্য মুখটিও যেন ঈর্ষা ও লোভের সামনে দ্বিগুণভাবে প্রকট হয়েছে।

কপালকুণ্ডলা নবকুমারের পারিবারিক জীবনে মৃন্ময়ী হিসাবে নতুন করে জীবন শুরু করেছে। রূপমুগ্ধ কৃতজ্ঞ নবকুমার তাতেই খুশি। তাঁর মা ও বোন তাঁকে ফিরে পেয়েছেন। সঙ্গে আবার নতুন বউ। সব মিলিয়ে একটি আনন্দঘন নিস্তরঙ্গ জীবনের সন্ধান মেলে এ-সময়। কপালকুণ্ডলার রূপ ও শান্ত-স্নিগ্ধ দিকটি নিয়েই তিনি সুখী। যেজন্য পদ্মাবতী তার রূপ-যৌবন, ধন-ঐশ্বর্য নিয়ে নবকুমারকে ফিরে পেতে চাইলেও নবকুমার তাঁকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

আর এখানেই উপন্যাসের মোড়। প্রত্যাখ্যাত ভুজঙ্গী মতিবিবি নবকুমারের

সুখের সংসারে কৌশলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। নবকুমারের দৃষ্টিতে তাকে অবিশ্বাসী করে তুলেছে। এদিকে কপালকুণ্ডলাও কেমন যেন উদাসীন। আজন্ম বন-জীবনে লালিত-পালিত হওয়ার তার সত্তায় মানবিক চাহিদাগুলির বিকাশ ঘটেনি। সেদিক থেকে নবকুমার দাম্পত্য জীবনে অসুখীই বলতে হবে। কিন্তু তাঁর চরিত্রের দুর্বলতা তাঁকে সন্দেহপ্রবণ করে তুলিছে। পূর্বাপর বিচার-বিবেচনার অবকাশ দেয়নি। নবকুমার চরিত্রের এই হটকারী আচরণ গঙ্গাসাগর ভ্রমণকালেও দেখেছি আমরা। কাজেই কপালকুণ্ডলাকে তিনি সন্দেহের আগুনে ফেলেছেন। এবং সেই আগুনে নিজেও পুড়েছেন, তাকেও পুড়িয়েছেন।

নবকুমার এক বিচিত্র চরিত্র। সৎ, নিষ্ঠাবান, পরোপকারী, ভাবুক ও উদাসীন। অন্যদিকে অবিবেচক, হটকারী, দূরদৃষ্টিহীন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্বল। সব মিলিয়ে এই হল নবকুমার চরিত্র। তবে নায়িকাপ্রধান উপন্যাস হিসাবে 'কপালকুণ্ডলা'-তে নবকুমার যতটা প্রয়োজন ঠিক ততটাই যেন পরিস্ফুট। বাংলা উপন্যাসে নবকুমার এক ভাগ্যবিড়ম্বিত অনন্যসাধারণ চরিত্র —তাতে সন্দেহ নেই।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

নীচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন—

প্রশ্ন নং ১ ঃ নবকুমার চরিত্রের মধ্যে কী কী বৈশিষ্ট্য রয়েছে?

.....

প্রশ্ন নং ২ ঃ নবকুমারের জীবনে কোন্ দুটি দিক তাঁর চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছে?

.....

৪.৩.২ কপালকুণ্ডলা

এবারে আলোচনা করা যাক উপন্যাসের নায়িকা কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে। নাম থেকেই প্রকট যে কপালকুণ্ডলা এই উপন্যাসের নায়িকা। তার জীবনই এখানে প্রতিপাদ্য বিষয়। স্বাভাবিকভাবে বঙ্কিম প্রথম থেকে তাকে এই অভূতপূর্ব চরিত্র রূপে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন। শৈশবে আরণ্যক প্রকৃতির মধ্যে বড় হয়ে উঠলে— সংসার জীবনে তার প্রভাব কেমন করে কীভাবে পড়বে —এই কথা বঙ্কিমকে ভাবিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীতে সেই তথ্য মেলে। কাজেই কপালকুণ্ডলা চরিত্রটি যে সর্বার্থে ব্যতিক্রমী —সে-বিষয়ে সংশয় নেই।

উপন্যাসে যখন কপালকুণ্ডলার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়, তখন সে তরুণী বা বলা যেতে পারে বিবাহ-উপযুক্ত। কিন্তু তার আগের জীবনের একটি ছোট্ট রেখাও পাওয়া যায়। জলদস্যুদের দ্বারা সে ছোটবেলা অপহৃত হয়ে সাগরতীরে পরিত্যক্ত হয়। কাপালিক তাকে কুড়িয়ে পেয়ে লালন করে। প্রকৃতির মধ্যেই তার শৈশব তথা বড় হয়ে

ওঠা। এমন প্রকৃতি যেখানে মানুষের কোনো আনাগোনা নেই। কাজেই কপালকুণ্ডলা আশৈশব মানুষ-বঞ্চিত জীবনেই অভ্যস্ত। সে শুধু দুজন মানুষকে চিনত। এক, কাপালিক। এবং দুই, অধিকারী। কাপালিক তাকে কী উদ্দেশ্য নিয়ে লালন-পালন করেছিল— তাও খুব স্পষ্ট। উদ্দেশ্য — সাধনপথে তাকে ব্যবহার। কাপালিক তাকে কী দৃষ্টিতে দেখত তাও কিন্তু বোঝা যায় না। কেননা কাপালিক কপালকুণ্ডলার জীবনের সর্বনাশের নিমিত্তই সপ্তগ্রামে এসেছিল এবং মতিবিবির সান্নিধ্যে সেই কাজ অনেকাংশে সফল করেও তুলেছিল। অতএব, বোঝা যায়— লালন-পালন ছাড়া কপালকুণ্ডলার সঙ্গে তার কোনো মানবিক বোধের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। দ্বিতীয়ত, কাপালিকের কর্মকাণ্ডও কপালকুণ্ডলা সুনজরে দেখেনি। নবকুমারকে বলি দেওয়ার চেষ্টা ঘটনাটি সম্ভবত প্রথম নয়। কপালকুণ্ডলা শৈশব থেকে কাপালিকের এই তথাকথিত ধর্মীয় রক্তলোলুপ চরিত্র দেখেই বড় হয়েছে। ফলে কাপালিকের সঙ্গে তার আবেগিক সম্পর্ক নিবিড় ছিল না বললেও অত্যুক্তি হয় না। বরং অধিকারী মশাইকে সে পিতৃতুল্য নির্ভরযোগ্য শুভানুধ্যায়ী রূপে বিবেচনা করেছে। তাঁর কাছ থেকে যৎসামান্য শিক্ষাও সে পেয়েছে। অধিকারীর নির্দেশে অজ্ঞাতকুলশীল নবকুমারকে বিয়ে করে নতুন জীবনের পথে পা বাড়িয়েছে।

কপালকুণ্ডলার জীবনকেও স্পষ্টত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক, বিবাহ পূর্ববর্তী। এবং দুই, বিবাহ পরবর্তী। বিবাহ পূর্ববর্তী স্তরের কিছুটা আমরা অলোচনা করেছি ইতিমধ্যে। তবে তার সঙ্গে আরও কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে। আশৈশব প্রকৃতির মধ্যে প্রায় মনুষ্যসংসর্গ ছাড়া বড় হওয়ায় কপালকুণ্ডলার স্বভাব-প্রকৃতিও সেরকমই হয়ে উঠেছে। অরণ্য ও সমুদ্রের যুগলবন্দি তার আচরণের মধ্যে যেন ধরা পড়েছে। চপল হরিণীর মতো তার প্রায় নিঃশব্দ পথচলা। স্তব্ধ অরণ্যের মতো সে মিতবাক আবার সমুদ্রের মতো সে গম্ভীর। তার ভাষা ও আচরণ তাই গাম্ভীর্য ও সংযমের দ্বারা আবৃত কাপালিকের প্রভাবে তার মধ্যে দৈবী শক্তি, বিশেষত শাক্ত বিশ্বাস প্রবল ছিল। আবার অধিকারীর সাহচর্য তাকে উদার ও মধুর দেবীপূজার সংস্কার দিয়েছিল। দেবীর উদ্দেশে নিবেদিত বিল্বপত্র পতিত হওয়া দেখে সে ভবিতব্য মেনে নেওয়ার সংকল্প করেছে। বলেছে—'যাহা বিধাতা করাইবেন, তাহাই করিব। যাহা কপালে আছে, তাহাই ঘটিবে। ...মা ত্রিপত্র ধারণ করিলেন না —অতএব কপালে...'

কপালকুণ্ডলা এক অদ্ভুত জীবন নিয়ে বড় হয়েছে। পূর্বোক্ত দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কাউকে সে দেখেইনি। কাজেই নারী-পুরুষ ভেদাভেদটি পর্যন্ত তার বোধে তেমন প্রকট ছিল না। এর প্রমাণ পাই নবকুমারকে দেখার পর তার অভিব্যক্তি দেখে। অপরিচিত যুবাপুরুষকে দেখে তরুণী-মনে যে-সংকোচ বা সলজ্জ ভাব অথবা প্রগল্‌ভতা — কোনো কিছুই কপালকুণ্ডলার আচরণে দেখা যায়নি। পলকহীন আয়তনয়নে শুধু তার জিজ্ঞাসা— 'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?' কাপালিক নবকুমারকে বলি দেবে—

এই সম্ভাবনা দেখে সে নবকুমারকে মুক্ত করেছে, একসঙ্গে পলায়ন করেছে। কিন্তু এর অন্তরালে শুধু তার অরণ্য-প্রকৃতিজাত সারল্যই প্রকট, অন্য কিছু নয়। অধিকারীর কাছে নবকুমারকে পৌঁছে দিয়ে নিজে সে কাপালিকের কাছে ফিরে যেতে চেয়েছে। এবং এই ফিরে যাওয়ার পরিণতিও সে জানে। তবু সে নির্বিকার। কেননা কপালকুণ্ডলা আত্ম-উদাসীন।

বিয়ে হল। বিয়ে কী — তাও সে জানে না। অধিকারীর মুখে যখন সে শুনল বিবাহই নারীর ধর্মের সোপান— জগন্মাতা ভবানীও শিবের গৃহিণী— তখন সে নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলেছে— 'তাহাই হোক।' নবকুমারের প্রতি কোনো আকর্ষণ থেকে সে এই বিয়েতে রাজি হয়নি, হয়েছে পরিস্থিতি ও কর্তব্যের তাগিদে। পারিবারিক-সামাজিক পরিবেশ সে পায়নি। পায়নি তার সংস্কার, শিক্ষা ও সভ্যতা। কপালকুণ্ডলাও তাই সামাজিক-পারিবারিক সংস্কারশূন্যা। ভালো-মন্দ, অগ্র-পশ্চাৎ ক্ষতি-বৃদ্ধি বিবেচনা তার নেই। মতিবিবি যখন পথে তাকে গয়না দান করে— সে অনায়াসে সেই গয়না ভিখিরির হাতে তুলে দেয়।

কপালকুণ্ডলার জীবনের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা স্বামীগৃহে বধূরূপে। এখানে তার নাম হয়েছে 'মৃন্ময়ী', সম্বোধনে 'মৃনো'। দাম্পত্য জীবন শুরু, পারিবারিক নীতি-প্রথার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ সে, অথচ তবুও যেন সে সেই বনের পাখি। এলোচুল বেঁধে গৃহবধূ হতে তার কোনো আগ্রহ নেই। স্বামী-সংসার-পরিবার-পরিজন, পোশাক-আশাক-অলংকার, সাজ-সজ্জা কিছুই তাকে সুখ দিতে পারে না। তাই কোনো দিনই সে যে সুখী হতে পারবে না— এরকম একটা বদ্ধমূল ধারণা ও সংস্কারও তার মধ্যে ক্রিয়া করেছে।

ইতিমধ্যে একটি বৎসর কেটে গেছে। কপালকুণ্ডলার 'মৃন্ময়ী' রূপে কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। সাজগোজেও খানিকটা বধূভাব এসেছে। কিন্তু সংস্কার আর যায় না। শ্যামাসুন্দরীর স্বামীকে বশ করার জন্য সে রাত্রিবেলা পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে একাই গিয়ে ঢুকেছে। ননদকে বলেছে— 'শুনেছ ত, রাত্রে বেড়ান আমার ছেলেবেলা হইতে অভ্যাস।' গৃহস্থের বউ-ঝি রাত্রে বেড়ানো ঠিক নয়— তার পক্ষে একা নিশীথে বাইরে যাওয়া চারিত্রিক ত্রুটির নামান্তর— এসব কথা শুনেও সে ভালোমন্দের পরোয়া করেনি। বরং বলেছে— 'যদি জানিতাম যে স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।'

এবং স্বামীকে সরাসরি উদ্দেশ্য বলেই সে রাত্রিবেলা ঘর থেকে ওষুধের সন্ধানে বেরিয়ে গেছে। লোকে মন্দ বলে বলুক, তার কোনো আসে যায় না।

গৃহপার্শ্বে বনভূমিতে গিয়ে তার সেই ফেলে আসা মুক্ত অবাধ জীবনের আনন্দময় সুখস্মৃতি মনে পড়েছে। প্রাণভরে শ্বাস নিয়েছে। সমুদ্রতীরের অরণ্য-জীবনকে ভুলতে পারেনি। সংসারের প্রতি তার তীব্র অনীহা। লৌকিক জীবন তাকে বাঁধতে পারেনি। তার মধ্যে বনচর জীবনের মুক্ত স্বভাবই ক্রিয়াশীল। ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে আঁধার

রাতে দেখা করার ক্ষেত্রেও তাই সে ভয়শূন্যা, সংকোচশূন্যা। একমাত্র ভৈরবী-ভবানীকেই সে মেনেছে। স্বপ্নবৃত্তান্তকে তাই মেনে নিয়েছে।

ব্রাহ্মণবেশী মতিবিবি ওরফে পদ্মাবতী যখন তাকে স্বামীত্যাগের পরামর্শ দিয়েছে— তখনও সে উদাসীন। নবকুমার তার মনে এই আছে, এই নেই। স্বামীত্যাগের কুমন্ত্রণা তাকে পীড়িত করেনি। অর্থাৎ আরণ্যক জীবন কপালকুণ্ডলাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। সেখান থেকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে অবশেষে মুক্তি লাভ করেছে। স্বামী নবকুমার তার কাছে সুখ-দুঃখের সারাজীবনের সঙ্গী হয়ে ওঠেননি— কেননা, তার দৃষ্টিতে তিনি শুধু ব্রাহ্মণকুমার। নারীসুলভ প্রণয় বৃত্তিও তার মধ্যে ছিল না। ছিল না ঘর-বাঁধা, স্বামী-পুত্রের আকাঙ্ক্ষা। পার্থিব জীবনের প্রতি কোনো আকর্ষণই তার মধ্যে দেখা যায়নি।

'প্রেতভূমে' নাম শেষ অধ্যায়ে নবকুমার কম্পিত, কিন্তু কপালকুণ্ডলা নির্ভীক, নির্বিকার, নিষ্কম্প। স্বামী তাকে চরিত্রহীনা ভেবেছেন, পালক-পিতা তাকে বধ করতে এসেছে। কাজেই আর বাকি কী রইল। জীবনে সুখ-আহ্লাদ কিছুই ছিল না। ছিল সামান্য একটু বন্ধন। সেই বন্ধন ছিন্ন করে মৃত্যুর মধ্যে শান্তিলাভ করতে চেয়েছে কপালকুণ্ডলা। এবং তা হয়েওছে। বন-জীবন ও সংসার-জীবনের দ্বন্দ্ব ও দোদুল্যমান চিত্ত অবশেষে নিষ্কৃতি পেয়েছে গঙ্গার চিরপ্রবহমান স্রোতে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

নীচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন—

প্রশ্ন নং ৩ ঃ অধিকারীর সান্নিধ্য কপালকুণ্ডলার জীবনে কী ধরনের প্রভাব ফেলেছিল?

.....

প্রশ্ন নং ৪ ঃ কপালকুণ্ডলার জীবনের প্রথম অংশে কাপালিকের প্রভাব ছিল কি?

.....



আপনাদের করণীয় — ৪.১

(ক) নবকুমারের জীবনে ভাগ্যবিড়ম্বনা কেন ও কীভাবে নেমে এসেছিল — আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)।

(খ) সংসার এলেও বনচর-জীবনের টান কপালকুণ্ডলা চরিত্রটিকে নিয়ন্ত্রণ কীভাবে করেছে — নিজের ভাষায় ব্যক্ত করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)।

৪.৩.৩ মতিবিবি

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র এই মতিবিবি। এর পূর্বনাম

পদ্মাবতী। সম্পর্কে নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী। পদ্মাবতীর পূর্ব ইতিহাস ঔপন্যাসিক সুকৌশলে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। পদ্মাবতীর পিতার নাম রামগোপাল ঘোষাল। নবকুমারের সঙ্গে বিয়ের পর পদ্মাবতী কিছুদিন পিত্রালয়ে ছিল। মধ্যে মধ্যে শ্বশুরালয়ে আনাগোনা ছিল। যখন পদ্মাবতীর বয়স তেরো, তখন তার পিতা সপরিবারে পুরুষোত্তম-দর্শনে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে তিনি পাঠানের হাতে ধরা পড়েন এবং ধর্ম বিসর্জন দিয়ে সপরিবার মুসলমান হয়ে রক্ষা পান। পদ্মাবতীও ধর্মান্তরিত হল। এবং যথারীতি স্বামী নবকুমারের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটল।

পদ্মাবতীর পিতা রামগোপাল উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ ছিলেন। তিনি আগ্রা গিয়ে প্রতিপত্তি, ক্ষমতা ও অর্থের পেছনে ধাবমান হলেন। তাঁর কন্যাটিও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করল। নতুন নাম হল লুফৎ-উন্নিসা। সে দেশ-বিদেশ ভ্রমণকালে 'মতিবিবি' নাম গ্রহণ করত। আগ্রাতে বয়স বাড়ল। রূপে-গুণে বিকশিত হল সে। নৃত্য-গীত, রসালাপ, বিভিন্ন ভাষা শিক্ষায় সুশিক্ষিত হল। কিন্তু যৌবন-ধর্ম ইন্দ্রিয়-লালসাও তার মধ্যে বেড়ে উঠল।

যৌবন-দোষে আক্রান্ত লুৎফাকে কেউই বিয়ে করতে রাজি হলেন না, কেননা তার পূর্ব স্বামী ছিল। কাজেই লুৎফ-উন্নিসাও ফুলে ফুলে বিহারের সংকল্প নিল। লুৎফ-উন্নিসা গোপনে যাঁদের কৃপা বিতরণ করত— তাঁদের মধ্যে স্বয়ং যুবরাজ সেলিমও একজন। সেলিমও মজলেন। কিন্তু পদ্মাবতী লক্ষ্য ভারত-সম্রাজ্ঞী হওয়া। ঐশ্বর্য-বিলাস, যশ-প্রতিপত্তি-ক্ষমতার স্বপ্ন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তার প্রথম বাধা মেহের-উন্নিসা। এই মেহেরের কথা সেলিমের মুখে শুনেই তার স্বপ্নভঙ্গ হল। এবং যে-মুহূর্তে সে বুঝল যে তার আর কোনো আশা-ভরসা নেই, সেই মুহূর্তে সে সেলিমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। মেহের-উন্নিসা তার বাল্যসখী। সেই বাল্যসখীর দাসী হয়ে সে থাকতে রাজি নয়। এবং ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে সে ওড়িশা পর্যন্ত গেল। ফেরার পথে তার সঙ্গে পান্থশালায় পূর্বস্বামী নবকুমারের সঙ্গে দেখা। বঞ্চিতা পদ্মাবতীর মনে অকস্মাৎ পূর্বস্মৃতি জেগে উঠল।

ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতাই মতিবিবি ওরফে লুৎফ-উন্নিসা ওরফে পদ্মাবতীর জীবনের মূল লক্ষ্য। ছলে-বলে-কৌশলে সে তার স্বার্থসিদ্ধি চায়। চায় ভোগের চরিতার্থতা। পথে নবকুমারকে দেখে তার মধ্যে আবার সেই ভোগী-লোভী সত্তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সেলিমকে সিঁড়ি বানিয়ে সে উচ্চ আসনে যখন উঠতেই পারল না— তখন নবকুমারের কন্দর্পকান্তি সৌম্য রূপ তাকে আবার আসঙ্গ লিপ্সার দিকে ঠেলে দিল। বর্ধমানে গিয়ে মেহের-উন্নিসার মনোভাবও সে জেনে গেছে। সব মিলিয়ে সপ্তগ্রামে ফিরে নবকুমারের সান্নিধ্যকে আঁকড়ে ধরতে চাইল। নবকুমারের সঙ্গে তার যখন বিয়ে হয়— তখন সে কিশোরী মাত্র। এখন সে পূর্ণ যৌবনা। অভিজ্ঞা। ছলাকলায় সিদ্ধা। কিন্তু তার জীবনে শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। আনন্দ নেই। জীবনে যা পেয়েছে— তাতে সে সন্তুষ্ট নয়। গভীর অতৃপ্তিই তার নিত্য সহচর।

তিন বছর রাজপ্রাসাদের ছায়ায় বসে যা সে পায়নি, উড়িষ্যা থেকে ফেরার পথে একরাত্রে নবকুমারের সান্নিধ্যে তা পেয়েছে সে। তাই মনে মনে সংকল্প নিয়েছে— নবকুমারকে তার চাইই চাই।

মতির মধ্যে রূপ-যৌবনের অহংকার ছিল। ভেবেছিল— নবকুমার তা পেয়ে গলে যাবেন। কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণ নবকুমার তাকে মুহূর্তেই প্রত্যাখ্যান করবেন— সে-কথা সে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। নারী সব সহ্য করতে পারে, পারে না শুধু ভালোবাসার অবমাননা সহ্য করতে। নবকুমারের এই তীব্র প্রত্যাখ্যান পদ্মাবতীকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। এ কূল ও কূল —সব কূল হারিয়ে তখন তার জীবন-নৌকা ঢলমল। সে ধারণা করে— কপালকুণ্ডলার রূপজ আকর্ষণের জন্যই নবকুমার তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাই সে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার দাম্পত্যজীবনে আগুন লাগাতে তৎপর হল। তার সঙ্গে এসে জুটল ঈর্ষা। কিন্তু কপালকুণ্ডলার সঙ্গে কথাবার্তায় সে বিস্মিত হল। কপালকুণ্ডলা অকপটে তাকে বলে— 'আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করিব? তোমার মানস সিদ্ধ হউক... ...আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।' কপালকুণ্ডলার এরকম সহৃদয় ত্যাগ সে কল্পনাও করেনি। তার সম্বিৎ ফিরে আসে, হৃদয়ে সহানুভূতির ফল্গুধারা বইতে থাকে। সে কপালকুণ্ডলাকে বাঁচাতে চায় কাপালিকের হাত থেকে। পাঠাতে চায় বর্ধমানে। কপালকুণ্ডলা রাজি না-হওয়াতে অশ্রুজলে তাকে একটি আংটি উপহার দেয়— চিরস্মৃতি অটুট রাখার জন্য। এরপর আর উপন্যাসে পদ্মাবতী বা লুৎফ-উন্নিসা বা মতিবিবির আর কোনো প্রসঙ্গ নেই। জীবনের পথে সে হারিয়ে যায়।

উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন— 'মতির চরিত্র মহাদোষে কলুষিত, মহদ্‌গুণেও শোভিত।' কথাটি যথার্থ। প্রভূত দোষের মধ্যে তার অন্তঃকরণে একটি সংবেদনশীল নারী ছিল। পরিস্থিতিও অনেকটা তাকে ভোগের পথে ইন্দ্রিয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণকন্যার সংস্কার সম্পূর্ণ নিঃশেষ করতে পারেনি। প্রথম যৌবনে স্বামীসুখ বঞ্চিতা হওয়ার ফলেই তার মধ্যে একটি অস্থিরচিত্ত নারীর জন্ম হয়। কিন্তু সেও হয়তো অবচেতনে স্বামী-পুত্র-পরিবারের স্বপ্ন লালন করত মনে। তাই নবকুমারকে আবার পেয়ে সেই অধরা স্বপ্নপূরণের সাধ জেগেছিল। তার হৃদয়ে উদারতারও স্পর্শ ছিল। সুন্দরী স্ত্রীলোক কপালকুণ্ডলাকে সে স্বল্প পরিচয়ের মধ্যেই অলংকার দান করেছে। মনের সুখে সাজিয়েছে। কপালকুণ্ডলাকে বিদায় কালেও দিয়েছে বহুমূল্য আংটি। না-পাওয়ার বেদনাই তাকে বারে বারে তরঙ্গ তাড়িত করেছে। এজন্য দু-দুটো ষড়যন্ত্রে সে লিপ্ত হয়েছে এবং ব্যর্থও হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সে তার অন্তরের কথাকে তুলে ধরতে দ্বিধা করেনি। মেহের-উন্নিসা ও সেলিম বৃত্তান্তে সে যখন তার ভাগ্যের পরিহাসকে বুঝেছে— তখন সে অকপটে সেলিমের কাছে পূর্ব স্বামীকে ফিরে পাবার অনুমতি প্রার্থনা করেছে। আবার, কপালকুণ্ডলার সর্বনাশ করতে

এসেও সে কপালকুণ্ডলাকে অকপটে নিজের জীবনের যাবতীয় কাহিনি বলেছে। দুই বিপরীত সত্তার মধ্যে পদ্মাবতী চরিত্রটি উদ্‌ভাসিত।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

নীচের প্রশ্নটির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন—

প্রশ্ন নং ৫ ঃ মতিবিবির চরিত্রের দুটি দিক কী কী?

.....

৪.৩.৪ কাপালিক

এবারে কাপালিক চরিত্রটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক। প্রচলিত অর্থে যাকে 'খলচরিত্র' বলে, কপালকুণ্ডলার খলচরিত্র এই কাপালিক। একটি বিশেষ দুর্লভ শ্রেণির মানুষ এই কাপালিক। এই শ্রেণির লোকেরা তন্ত্রসাধক হয়। এই তান্ত্রিকেরা তাদের 'সাধনা'র নামে নরবলি দেয়। এরা শক্তি-সাধনা করে। এবং ভক্তির নামে কদাচারী বা বামাচারী হয়। অন্ধবিশ্বাসই এদের পুঁজি। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এরা এক ধরনের মানসিক বিকৃতির শিকারও বলা যেতে পারে।

'স্তূপশিখরে' নামক অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র নবকুমারের দৃষ্টিতে কাপালিকের এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন উপন্যাসের শুরুতে। সমুদ্রতীরে পরিত্যক্ত ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর নবকুমার দেখেছেন দূরে একটি অগ্নিবিন্দু। ক্রমশ কাছে গিয়ে দেখা গিয়েছে— একটি মানুষ চোখ বন্ধ করে ধ্যানমগ্ন।

একটা ভয়ংকর পরিবেশে ভয়ানকভাবে এই কাপালিকের সঙ্গে নবকুমারের মতো আমাদেরও দেখা। আমরা আরও দেখলাম, চারপাশে ছড়ানো মনুষ্য-হাড়। মানুষের হাড় দিয়ে বানানো মালা ঝুলছে তান্ত্রিকের গলায়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এহেন পরিবেশ থেকে বোঝা যায়, নররক্তে দেবীপূজা করে সাধনায় সিদ্ধি লাভের কৃচ্ছ্রসাধনায় লিপ্ত এই কাপালিক। একটি গলিত শবের ওপর বসে যে-ব্যক্তি 'সাধনা' করতে পারে— সে যে কতটা ভয়ানক, সে-কথা নবকুমার বোঝেননি।

কাপালিক চরিত্র বীভৎস মানসিকতার। নবকুমার যখন ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে আশ্রয় সন্ধান করেছেন— তখন কাপালিক তাঁকে বলেছে— 'ভৈরবীপ্রেরিতোহসি মামনুসরঃ'। অর্থাৎ তোমাকে ভৈরবী প্রেরণ করেছেন এখানে, আমার পেছনে এসো। ভৈরবী নবকুমারকে বলিপ্রদত্ত মনুষ্য হিসাবে প্রেরণ করেছেন— এই বিশ্বাসই কাপালিকের সত্তার মূল দিক। সে একমাত্র জানে তার অন্ধ বিকৃত বিশ্বাসকে। মনুষ্যরক্তে রঞ্জিত হয়ে ভৈরবীর সাধনা করে সে সিদ্ধকাম হতে চায়।

কপালকুণ্ডলার বুদ্ধিতে নবকুমারের জীবন রক্ষা হয়েছে এবং অধিকারী মশাইর

মুখ থেকে আমরা এই কাপালিকের সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য লাভ করেছি। অধিকারী বলেছেন— এই 'মহাপুরুষ' অতি ভয়ানক। তার পক্ষে যে-কোনো কাজই সম্ভব। বাহ্যত উপন্যাসের নায়িকা কপালকুণ্ডলার পালক-পিতা এই তান্ত্রিক। সমুদ্রতীরে শিশু কপালকুণ্ডলাকে পেয়ে সে লালন-পালন করেছিল। কিন্তু পালনকারী হলেও সে 'পিতা' হয়ে উঠেনি। পিতৃত্বের ছিঁটেফোঁটাও তার মধ্যে ছিল না। এমনকি কপালকুণ্ডলাকে পালনের মধ্যে তার কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না। কপালকুণ্ডলা যদিও পালনকারীর প্রতি সহমর্মিতা ব্যক্ত করেছে এইভাবে— 'তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে আমার মন সরিতেছে না। তিনি যে আমাকে এতদিন প্রতিপালন করিয়াছেন।' উত্তরে অধিকারী তাকে বলেছেন— 'কি জন্য প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহা জান না।' এরপর বঙ্কিমের ভাষায় ঃ 'অধিকারী তান্ত্রিক সাধনে স্ত্রীলোকের যে সম্বন্ধ, তাহা অস্পষ্ট রকম কপালকুণ্ডলাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, অর্থাৎ, সোজা কথায়— কাপালিক একজন বিকৃতকামী— কপালকুণ্ডলাকে লালন করেছে এইজন্য যে একদিন সে বড় হবে এবং তার বামাচারী তন্ত্র-সাধনার সঙ্গিনী হবে। অধিকারী মশাইর ভাষায়— 'কাপালিক ইহাকে (কপালকুণ্ডলাকে) প্রাপ্ত হইয়া আপন যোগসিদ্ধিমানসে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অচিরাৎ আত্মপ্রয়োজন সিদ্ধ করিতেন।'

এই হল কাপালিক চরিত্রের আসল দিক। কপালকুণ্ডলার ক্ষেত্রে তার পিতৃত্ব ছিল না। ছিল একমাত্র অন্ধ ধর্মীয় গোড়ামি। এবং ধর্মের নামে যে-কোনো পর্যায়ে তার চরিত্র অবনমিত হতে পারে। এর প্রমাণ আমরা পাই উপন্যাসের উপান্তে।

কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের বিবাহের পর কাপালিকের আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রথম খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে শুধু জানা গেছে পলাতক নবকুমার ও কপালকুণ্ডলাকে খুঁজতে খুঁজতে কাপালিক এক উচ্চ বালিয়াড়ির ওপর ওঠে এবং 'পর্বতচ্যুত মহিষের ন্যায়' পড়ে যায়।

চতুর্থ খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ থেকে জানা যায়— বালিয়াড়ির ওপর থেকে পতনের ফলে কাপালিকের উভয় বাহু ভগ্ন হয়েছে। নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ চলে, কিন্তু ওই বাহু দ্বারা বলপ্রয়োগ তো দূরের কথা কাষ্ঠ সংগ্রহও করতে পারে না কাপালিক। একেই বলে নিয়তি। একদিন যে-বাহু অসহায় মানুষকে বলি দিত— সেই বাহু চিরদিনের জন্য ভগ্ন হয়েছে। কিন্তু দুরাচারী কাপালিকের মনের বিষ কমেনি। কপালকুণ্ডলার প্রতি প্রতিহিংসায় সে খুঁজতে খুঁজতে এসে সপ্তগ্রামে নবকুমারের গৃহসংলগ্ন জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। এখানেও তার অন্ধ ধর্মীয় সংস্কার প্রকট। সে ভবানীর নামে কপালকুণ্ডলাকে বলি দিতে চায়। স্বপ্নে নাকি সেই নির্দেশই পেয়েছে। কিন্তু বলি দেওয়ার শক্তি তার নেই। তাই নবকুমারের কপালকুণ্ডলার প্রতি সন্দেহের সুযোগ নিয়ে সে নবকুমারকে দিয়ে কার্য উদ্ধারে তৎপর হয়েছে। তার প্রবৃত্তি জাগানোর জন্য তাকে আকণ্ঠ মদ্যপান করিয়েছে। অর্থাৎ অশক্ত শরীরেও সে শ্বাপদের মতো প্রতিহিংসাপরায়ণতায় ভুগেছে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

নীচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন—

প্রশ্ন নং ৬ ঃ কাপালিক কপালকুণ্ডলাকে কেন প্রতিপালন করেছিল?

.....

প্রশ্ন নং ৭ ঃ কাপালিক কপালকুণ্ডলাকে কেন বলি দিতে চেয়েছিল?

.....



আপনাদের করণীয় — ৪.২

(গ) কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে মতিবিবির প্রাসঙ্গিকতা কতখানি — আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

(ঘ)অরণ্য-জীবন ও গৃহ-জীবন — এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব আলোচ্য উপন্যাসে কীভাবে পরিস্ফুট — আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৪.৪ অলৌকিকতা

আসুন, সব শেষে আমরা এই উপন্যাসে অলৌকিকতা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করি। লৌকিক দৃষ্টিতে যার ব্যাখ্যা আপাতত কঠিন— সেইসব দৈবী ঘটনাকে অলৌকিক বলেই চিহ্নিত করা হয়। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের শুরু থেকে কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা রয়েছে। জীবন-রহস্যের দুর্জ্ঞেয় দিকগুলোই এর দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে।

কাপালিকের কবল থেকে নবকুমারকে নিয়ে অধিকারী মশাইর মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে কপালকুণ্ডলা। অধিকারী কপালকুণ্ডলার ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাকে বিয়ে দিতে চেয়েছেন। এবং এর জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেছেন দেবীর কাছে, বিল্বপত্র প্রদানের মধ্য দিয়ে। প্রথমবার বিল্বপত্র পতিত হয়নি। কিন্তু বিয়ের পর যাত্রার প্রাক্কালে কপালকুণ্ডলা কালী-প্রণামার্থে মন্দিরে গেল। তারপর— "ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া, পুষ্পপাত্র হইতে অভিন্ন বিল্বপত্র প্রতিমার পাদোপরি স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। পত্রটি পড়িয়া গেল।" ভক্তিপরায়ণা কপালকুণ্ডলা এতে অত্যন্ত ভীত হল। এবং ঘটনাটি শুনে বিষণ্ণ হলেন স্বয়ং অধিকারীও। একটা অনিশ্চয়তা, অমঙ্গলময়তার ছায়া যেন ঘনীভূত হল। অধিকারী বললেন— "এখন নিরুপায়; এখন পতিমাত্র তোমার ধর্ম। পতি শ্মশানে গেলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে। অতএব নিঃশব্দে চল।"

মাতৃপদে অর্পিত বিল্বপত্রটি মা গ্রহণ করেননি— এই গ্রহণ-না করার সংকেতটির মধ্যে রয়ে গেছে উপন্যাসের পরিণতির ইঙ্গিত। বাহ্যত ঘটনাটি নিতান্তই সহজ ও বিশ্বাসজাত। কিন্তু ব্যঞ্জনার্থে

বোঝা যায়— এই আকস্মিক বিবাহ সুখের সংসার হয়ে উঠবে না। এর পরিণতি ভয়াবহ। ধ্বংসাত্মক। তান্ত্রিকের দ্বারা প্রতিপালিত কপালকুণ্ডলার মধ্যে আশৈশব ধর্মীয় সংস্কার প্রকট থাকাই স্বাভাবিক। এবং কালীমায়ের পায়ে নিবেদিত বেলপাতার পতনটি তার মনোগঠনে আলোড়ন তুলেছে। সে ঘটনাটিকে ভোলেনি। এবং একটি সুদূরপ্রসারী ছাপও থেকে গেছে এতে। বিবাহিত জীবনে কথাপ্রসঙ্গে সে ননদ শ্যামাসুন্দরীকে বলেছে— "যাহা বিধাতা করাইবেন, তাহাই করিব। যাহা কপালে আছে তাহাই ঘটিবে।" কেননা— "যে দিন স্বামীর সহিত যাত্রা করি, যাত্রাকালে আমি ভবানীর পায়ে ত্রিপত্র দিতে গেলাম। আমি মার পাদপদ্মে ত্রিপত্র না দিয়া কোন কর্ম করিতাম না। যদি কর্মে শুভ হইবার হইত, তবে মা ত্রিপত্র ধারণ করিতেন; যদি অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে ত্রিপত্র পড়িয়া যাইত। ...ত্রিপত্র মা ধারণ করিলেন না— অতএব কপালে কি আছে জানি না।"

অর্থাৎ কপালকুণ্ডলার জীবনে এই ঘটনাটি চূড়ান্ত পরিণতির সূচক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংসারের বাস্তব বুদ্ধি তার ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হয়নি, হয়েছি সংস্কার তথা ওই অলৌকিক মুহূর্তটি। সে ধরেই নিয়েছে, বিয়ের শুরুতেই যখন কালীমাতা তার বিল্বপত্রটি গ্রহণ করেননি— সুতরাং সুখ-শান্তি-স্বস্তি তার জীবনে নেই। এবং তার বিশ্বাসই উপন্যাসকে পরিণতির দিকে ঠেলে দিতে বাধ্য করেছে।

*কপালকুণ্ডলা*তে আরও দুটি অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ঘটাতে চেয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র — (১) কাপালিকের স্বপ্ন, এবং (২) কপালকুণ্ডলার স্বপ্ন। স্বপ্ন ব্যাপারটির আধুনিকতামণ্ডিত ব্যাখ্যা হতেই পারে, কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসে সেই দুটি স্বপ্নকে এক অলৌকিক-অদৃশ্য নিয়তির গূঢ় নির্দেশ জাতীয় ইঙ্গিত রূপে উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক।

ভগ্নবাহু কাপালিক যখন পীড়িত, ক্ষণে জ্ঞান, ক্ষণে অজ্ঞান তখন একদিক প্রাতে যেন সে শুনতে পেয়েছে আরাধ্য দেবী মাতা ভৈরবীর আদেশ— 'ইন্দ্রিয় চরিতার্থতায় তুই এতদিন কুমারীর শোণিত উৎসর্গ করিসনি, আমার পূজায় তাই এত বিঘ্ন।' এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কপালকুণ্ডলাকে বলি দিতে হবে। এখানে দেবীর স্বপ্নাদেশ অলৌকিকভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে— এবং কপালকুণ্ডলার জীবনের নাটকীয় পরিণামের সহায়ক হয়েছে।

দ্বিতীয় স্বপ্নটি নায়িকা কপালকুণ্ডলার। বাইরে ঝড়। কপালকুণ্ডলার মনেও ঝড়। সেই রাত্রে তার স্বপ্নেও ঝড়ের প্রকোপ। এক উন্নত-জটা প্রকাণ্ড কাপালিক তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে চাইছে। এমন সময় এক ব্রাহ্মণবেশী এসে তার জীবনতরী রক্ষা করে। কপালকুণ্ডলা তাকে 'নিমগ্ন কর' বলতে সে ছেড়েও দেয়। তখন তরীটি মুখর হয়ে বলে ওঠে— 'আমি আর এই ভার বইতে পারি না, আমি পাতালে প্রবেশ করি। এবং সত্যি সত্যি নৌকোটি তাকে জলে ফেলে পাতালে প্রবেশ করে।

এই স্বপ্নের মধ্যেও একটি অলৌকিকতার আভাস আছে। এখানে ব্রাহ্মণবেশী আসলে মতিবিবি। আর কাপালিক পূর্বোক্ত পালক পিতা। আত্মবিসর্জনের সংকল্পও এই ঘটনারই রেশ। এবং তখনই সে শুনতে পায়— এক দৈববাণী। ঊর্ধ্বে তাকিয়ে দেখে ভৈরবী দক্ষিণ হস্ত তুলে

তাকে আহ্বান করছেন। মুণ্ডমালাধারিণী ভৈরবীই যেন কপালকুণ্ডলার জীবনের পথ-নির্দেশক। মেঘের মধ্যে তিনি কখনো স্পষ্ট, কখনো-বা অস্পষ্ট। শ্মশানের দিকে তাকে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি। এবং তখন কপালকুণ্ডলা দেখে তিনি আকাশে অট্টহাস্যরতা। একটি দীর্ঘ ত্রিশূল ধরে কাপালিকের পথের দিকে তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ।

এই সব অলৌকিক ইঙ্গিত উপন্যাসের মূল উপজীব্য অর্থাৎ কপালকুণ্ডলার নির্মম পরিণতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও ইঙ্গিত বহন করে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

নীচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন—

প্রশ্ন নং ৮ ঃ কাপালিকের স্বপ্নটি কী ছিল?

.....



আপনাদের করণীয় — ৪.৩

(ঙ) *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসে অলৌকিক দৃশ্য সংযোজনের ফলে উপন্যাসটি কীভাবে পরিণতির দিকে গেছে — আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)



৪.৫ অধ্যায়-সংক্ষেপ

- এই অধ্যায়টি অবলম্বনে আমরা উপন্যাসের চারটি মুখ্য চরিত্র সম্পর্কে অবহিত হলাম। উপন্যাসের নায়ক নবকুমার এক ভাগ্যবিড়ম্বিত ও রোমান্টিক মেজাজের ব্যক্তি। বস্তুত, নায়িকা কপালকুণ্ডলার জীবনকে আলোকিত করার জন্যেই নবকুমার চরিত্রের অবতারণা ও প্রাসঙ্গিকতা।
- নায়িকা কপালকুণ্ডলা আশৈশব বন্য-জীবনে পালিতা হওয়ায় তার মধ্যে সেই সংস্কারই আগাগোড়া প্রকট। সংসার তাকে বাঁধতে পারেনি। মুক্ত জীবনই তার কাম্য ছিল। তাই মৃত্যুর মধ্যে তার চিরমুক্তি ঘটেছে।
- উপন্যাসের প্রতি-নায়িকা মতিবিবি ওরফে পদ্মাবতী অত্যন্ত আকর্ষণীয় চরিত্র। প্রবৃত্তি ও জীবন — এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে তার বিকাশ। কাপালিক চরিত্রের মূল প্রতিপাদ্য হল ধর্মীয় অন্ধ কুসংস্কার ও প্রতিহিংসা।
- উপন্যাসে কিছুটা অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ উপন্যাসটিকে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে।



৪.৬ অতিরিক্ত পঠন

১) বাগচী, শশাঙ্কশেখর (সম্পাঃ); *কপালকুণ্ডলা।*

২) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার; *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।*

৩) বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ; *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর।*

৪) ভট্টাচার্য, অরূপকুমার; *উপন্যাসশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র।*

৫) সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র; *বঙ্কিমচন্দ্র।*



৪.৭ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ নবকুমারের মধ্যে এক রোমান্টিক-ভাবুক-সৌন্দর্যবিলাসী মানুষ দেখা যায়।

২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ নবকুমার একদিকে সৎ, নিষ্ঠাবান, পরোপকারী, ভাবুক ও উদাসীন। আবার অন্যদিকে অবিবেচক, হটকারী ও দূরদৃষ্টিহীন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্বল।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ অধিকারীর সান্নিধ্য কপালকুণ্ডলার মধ্যে এক মানবিক অনুভূতির জন্ম দিয়েছিল।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ধর্মীয় বিশ্বাস, বিশেষত দৈব শক্তির ওপর আস্থা এবং অরণ্য-জীবনের প্রতি মোহ।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ মতিবিবির মধ্যে প্রবৃত্তি-তাড়িত, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এক নারী ছিল। আবার তার মধ্যে সহানুভূতিশীল নারী-হৃদয়ও দেখা গেছে।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কাপালিক কপালকুণ্ডলাকে তার সাধন-সঙ্গিনী করার জন্যে প্রতিপালন করেছিল।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য; কেননা কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে পলায়ন করতে সাহায্য করেছিল। দ্বিতীয় করণ, ধর্মীয় বিশ্বাস — যেখানে সে স্বপ্নে ভবানীর আদেশ পেয়েছিল।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কাপালিক স্বপ্নে দেখেছে — মা ভবানী তাকে আদেশ করছেন — 'ইন্দ্রিয় চরিতার্থতায় তুই এতদিন কুমারীর শোণিত উৎসর্গ করিসনি, আমার পূজায় তাই এত বিঘ্ন।' তাই কপালকুণ্ডলাকে বলি দিতে হবে।



৪.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

প্রশ্ন ১ ঃ নবকুমারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

প্রশ্ন ২ ঃ কপালকুণ্ডলা চরিত্রের মধ্যে দুই বিপরীত সত্তা কীভাবে চরিত্রটিকে চালিত করছে— নিজের ভাষায় ব্যক্ত করুন।

প্রশ্ন ৩ ঃ প্রবৃত্তি ও মানবিকতা — এই দুই দিক মতিবিবির জীবনকে কীভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে, সে-বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করুন।

প্রশ্ন ৪ ঃ 'কাপালিক এই উপন্যাসে এক ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসী, হিংস্র ও অমানবিক উপাদানে তৈরী।' — আলোচনা করুন।

প্রশ্ন ৫ ঃ আলোচ্য উপন্যাসে অলৌকিকতার প্রাসঙ্গিকতা কতখানি — নিজের অভিমত জ্ঞাপন করুন।

*** ***** ***